যমযম : পবিত্র পানির বিস্ময়কর প্রবাহ

মঈন উদ্দীন আহমদ

হজের মৌসুম এলেই জমজমের স্মৃতি, কেরামত এবং অত্যাশ্চার্য বৈশিষ্ট্যসমূহ আমার হৃদয়পটে ভেসে উঠে। যে ঘটনায় জমজম আমার স্মৃতিতে অনন্য হয়ে উঠেছে সে স্মৃতিতে ফিরে যাওয়া যাক।

১৯৭১ সনের কথা- একজন মিসরীয় চিকিৎসক ইউরোপীয় পত্রপত্রিকায় লিখলেন যে, আবে জমজম বা জমজমের পানি পানীয় জল হিসেবে পানের উপযুক্ত নয়। এ ধরনের বক্তব্য সাধারণত তারাই করে থাকে যাদের ইসলাম সম্পর্কে অবজ্ঞা, ঘৃণা এবং ভীতি রয়েছে। তিনি হয়তো লক্ষ্য করেছেন যে, যেহেতু খানা-ই-কাবা সমুদ্র স্তর থেকে নিম্নে এবং মক্কা শরীফের মাঝখানে অবস্থিত, ফলে শহরের সম্পূর্ণ ময়লা পানি চুয়ে জমজম কুপে গিয়ে জমা হয়।

আমরা বিশ্বাস করি খানা-ই-কাবা শুধু মক্কার মধ্যস্থলে নয়, পৃথিবীর মধ্যস্থলে। খানা-ই-কাবা ও জমজম হলো আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। জাগতিক দৃষ্টি দিয়ে তা বুঝা ও ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

মিসরীয় বুদ্ধিজীবীর বক্তব্য তৎকালীন, সৌদী বাদশাহ মরহুম ফয়সলের গোচরীভুত হয়। তিনি অত্যন্ত মনক্ষুন্ন এবং রাগান্বিত হলেন। এ ধরনের বক্তব্য যে অসার- এ বিশ্বাস তার ছিল।

বাদশাহ ফয়সাল সঙ্গে সঙ্গে সৌদী আরবের 'কৃষি এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়'কে বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে নির্দেশ দিলেন। তিনি আরও নির্দেশ দেন যে, ইউরোপের উচ্চমানের ল্যাবরেটরিগুলোতে পরীক্ষার জন্য আব-ই-জমজম প্রেরণ করা হোক।

সৌদী কৃষি ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এ দায়িত্ব সম্পাদনের নির্দেশ দিলেন 'জেদ্দা বিদ্যুৎ ও পানি লবণ মুক্তকরণ' সংস্থাকে (ণেঢটটদ মেষণর টভঢ ঢগ্রমফর্টধমভ ফেটর্ভ্র)। এই সংস্থাটি সমুদ্র থেকে পানি উত্তোলন করে তা লবণমুক্ত করে জেদ্দা শহরে বিতরণের দায়িত্বে ছিল।

আমি ঐ সময় জেদ্দা পাওয়ার এন্ড ডিসেলাইনেসন প্লান্টস, এ লবণমুক্তকরণ প্রকৌশলী ডিসলটিং ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে নিযুক্ত ছিলাম। পেশা শিক্ষাগতভাবে আমি একজন কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার।

ইউরোপীয় ল্যাবরেটরীসমূহে আব-ই-জমজম-এর পানি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেয়ার কাজের দায়িত্ব আমার উপর পড়ল।

ঐ সময় অন্যান্য মুসুলমদের জমজম-এর পানি সম্পর্কে যে শ্রদ্ধা মিশ্রিত অনুভূতি থাকে তার বেশী আমার কোন পূর্ব ধারণা ছিল না। এই পানির গুণাগুণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও আমার কোন পেশাগত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা ছিল না। কর্তৃপক্ষ হতে নির্দেশ পাওয়ার পরই আমি খানা- ই-কাবা প্রশাসনের নিকট আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য সম্মতি চাইলাম এবং তাদের দপ্তরে রিপোর্ট করলাম। তারাও সকল সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন এবং প্রয়োজনীয় জনবল আমাকে দিলেন।

জমজম কূপ এলাকায় উপস্থিত হয়ে আমি কূপটির বিভিন্ন দিক পরীক্ষা করলাম। এ কূপ সম্পর্কে আমার পূর্বে কোন ধারণা ছিল না।

লক্ষ্য করলাম যে, অন্যান্য কূপের মত জমজম কূপটি গোল নয়। এটা প্রায় ১৮ ফুট দীর্ঘ এবং ১৪ ফুট চওড়া একটি আয়ত ক্ষেত্রের মত। আর এই ক্ষুদ্র কূপটি হতে কোটি কোটি গ্যালন পানি প্রতিবছর হাজীরা পান করেন- ব্যবহার করেন এবং দেশে দেশে নিয়ে যান। এ ধারা অব্যাহত আছে বহু শাতাব্দী পূর্ব থেকে– হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর আমল থেকে।

জমজম কূপ পরীক্ষা ও তদন্তকালে আমি কূপটির দৈর্ঘ্য, প্রস্ত ছাড়াও অন্যান্য দিকগুলো দেখতে চাইলাম। একজন লোককে কূপটিতে নামতে বললাম। তিনি গোসল করে পাক-পবিত্র হয়ে জমজম কূপে অবতরণ করলেন।

তার শারীরিক উচ্চতা ছিলো ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি, তিনি ভক্তি- সম্ভ্রম মিশ্রিত ভীতির সঙ্গে কূপে অবতরণ করলেন। সাহস সঞ্চয় করে কূপের মাঝখানে অগ্রসর হলেন এবং সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। কূপের পানি উচ্চতা তার কাঁধ পর্যন্ত হলো।

তাকে নির্দেশ দেয়া হলো কূপের এক পাশ থেকে অন্য পাশে, এক কোণা থেকে অন্য কোণা এবং সর্বত্র হেঁটে বেড়াতে, তবে ডুবে না যাওয়া পর্যন্ত মস্তক পানির মধ্যে না ডুবাতে তিনি নির্দেশিত ছিলেন । হেঁটে হেঁটে কোন জায়গা হতে পানি কূপের মধ্যে আসে- তা খঁজে বের করাতে তাকে নির্দেশ দেয়া হলো। যে হারে এবং পরিমাণে পানি তোলা হয়, তাতে এ ক্ষুদ্র কূপটি পূর্ণ হতে পানির বহুধারা বা বহু পাইপ লাইন থাকার কথা।

তিনি বহু চেষ্টা করেও কোন ছিদ্র বা পাইপ বা কোন গর্ত হতে পানিটা কূপে এসে জমা হচ্ছে, তা খুঁজে বের করতে পারলেন না। কোন পথে পানি কূপে আসে তা আবিষ্কারের চেষ্টা ব্যর্থ হলো।

বাধ্য হয়ে আমাকে পানির উৎস ধারা আবিষ্কারের জন্য বিকল্প চিন্তা করতে হলো। জমজম কূপ থেকে উপরে পানি সঞ্চয় (স্টোরেজ) ট্যাঙ্কগুলোতে পানি তোলার জন্য কতগুলো পানি উত্তোলন পাম্প লাগানো ছিল। আমি ভাবলাম অধিকতর শক্তিসম্পন্ন বড় আকার ও ব্যাসের আরো অনেকগুলো পাম্প লাগালে অতি দ্রুত পানি তোলা হবে এবং কূপটি খালি হয়ে যাবে। যেভাবে একটি পুকুরের বা হ্রদের পানি সেচন করে পানি অত্যত্র প্রবাহিত করে জলাশয় শুকিয়ে ফেলা হয় সেরূপ করতে হবে।

সব পানি কিছু সময়ের জন্য পাম্প করে তুলে শুকিয়ে ফেলা হলে কোন দিক থেকে পানি চুয়ে চুয়ে আসে তা বোঝা যাবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় পাম্প করে জমজমের সব পানি তুলে কূপটি শুকানো গেল না।

কূপটি শুকিয়ে পানির উৎস বের করার অন্য কোন সফল পদ্ধতিও আমি চিন্তা করতে পারলাম না। ফলে আরও শক্তিশালী পাম্প লাগিয়ে পানি উত্তোলন করে কূপটি শুকিয়ে নেয়া যায় এবং কোন পথে পানি কূপে আসে তা দেখার চেষ্টা অব্যাহত রাখলাম। তাও সফল হল না। যতই পানি তোলা হয় ততই নতুন পানি জমা হয় এবং পানি একটা নির্দিষ্ট স্তরে থাকে। এ পদ্ধতিতে দীর্ঘ সময় ধরে কূপ শুকাবার কাজে কোন সফলতা অর্জন করা গেল না।

তখন আমি কূপে নামানো লোকদের নির্দেশ দিলাম এক স্থানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে। এদিকে পাম্পের মাধ্যমে পানি তোলে নেয়ার প্রক্রিয়া অব্যাহত রইলো। আমি কূপে- নামা লোকদের নির্দেশ দিলাম এবং গভীর মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করতে বললাম। আরো বললাম কূপের মধ্যে পানি তোলাকালে কোন লক্ষণীয় ঘটনা ঘটে কি না?

এই প্রক্রিয়া চলাকালে কূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা এক ব্যক্তি হঠাৎ করে হাত তুলে আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহু অকবার বলে চিৎকার করে উঠলেন। তিনি পানির উৎসের সন্ধান পেয়েছেন । তা কোন ছিদ্র নয়, বরং তিনি যে বালির উপর দাঁড়িয়ে ছিলেন- সে ক্ষুদ্র বালির কণা মনে হচ্ছিল- তার পায়ের নীচে নৃত্য করছে।

অতঃপর তিনি কূপের বুকে (তলায়) বহুবার বিভিন্ন দিকে পদচারণা করলেন এবং পাম্প চলাকালে অনুরূপভাবে পায়ের নীছে বালু কণার নৃত্য ভঙ্গি উপলব্ধি করলেন। বস্ততঃ কূপের তলার সমস্ত অংশে পানি উৎলে উঠার গতি সমান বলে মনে হলো। কূপের কোন অংশেই পানির স্তর কম-বেশী হত না। কূপের মধ্যে সর্বত্র পানির উচ্চতা সমানই ছিল।

আমি আমার জ্ঞান, মেধা ও মনে উথাপিত প্রশ্ন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলাম, পনির সেম্পল নিলাম। এই সেম্পলগুলো ইউরোপের বহু ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষার জন্য প্রেরণের যথাযথ ব্যবস্থা নিলাম।

জমজম সংক্রান্ত দায়িত্ব সম্পাদন করে বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে আমি কাবা কর্তৃপক্ষকে মক্কা শহরে অপরাপর কূপগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলাম। তারা জানালেন যে, অধিকাংশ কূপই ঐ সময় ছিল অনেকটা শুষ্ক।

আমার পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে আমার রিপোর্ট আমি আমার উপরস্থ কর্মকর্তার নিকট পেশ করলাম। তিনি গভীর উৎসাহ ও মনোযোগের সঙ্গে আমার কথা শুনলেন। সব কিছু শোনার পর তিনি একটি মন্তব্য করলেন- যা মেনে নিতে আমর মন সায় দিল না।

তিনি বললেন, আভ্যন্তরীণভাবে জমজম কূপের সঙ্গে লোহিত সাগরের সংযোগ রয়েছে। লোহিত সাগরের পানি চুয়ে চুয়ে জমজম কূপে আসে। সাগরের পানি শেষ হওয়ার কথা নয়।

আমার মনে নানা প্রশ্ন জাগলো। মক্কা হতে জেদ্দার দূরত্ব ৭৫ কিলোমিটার। জমজম কূপের পানি যদি লোহিত সাগর থেকে আসে- জেদ্দা থেকে মক্কা মধ্যবর্তী স্থানে কূপগুলোতেও কমবেশী পানি থাকবে। মক্কার পূর্ব দিকের কূপগুলোতেও কিছু পানি যাবে। শুধুমাত্র জমজম কূপেই লোহিত সাগরের পানি যাবে, অন্যান্য কূপগুলোতে যাবে না কেন? কিন্তু মক্কা থেকে জেদ্দা পর্যন্ত এই এলাকার অধিকাংশ কূপই থাকে শুকনো। বেশী পানি তুললে পানি শেষ হয়ে যায়- তাই কূপের দখল নিয়ে হয় মারামারি।

জমজম কূপের পানির যে সেম্পল ইউরোপের ল্যাবরেটরীগুলোতে পাঠানো হয়েছিল, তাদের থেকে পানি পরীক্ষার রিপোর্ট পাওয়া গেল। আমরা আমাদের ল্যাবরেটরীতেও পানি পরীক্ষা করে রিপোর্ট প্রণয়ন করে রেখেছিলাম। দেখা গেল ইউরোপীয় ল্যাবরেটরী থেকে প্রাপ্ত রিপোর্ট এবং আমাদের রিপোর্ট এর ফলাফল একই রকম (অলমোস্ট আইডেন্টিক্যাল)।

ইউরোপীয় রিপোর্ট এবং আমাদের রিপোর্টের মধ্য হতে যে বিষয়টি প্রতীয়মান, তা হলো- জমজম কূপের পানিতে ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়াম সল্টের পরিমাণ মক্কার অন্যান্য কূপের পানি হতে অপেক্ষাকৃত বেশী।

ম্যাগনেসিয়াম সল্ট এবং ক্যালসিয়ামের অধিক্যের কারণেই জমজমের পানি খেয়ে ক্লান্ত হাজীদের ক্লান্তি বিদূরিত হয়। আরও একটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য জমজমের পানিতে পরিলক্ষিত হলো জমজমের পানিতে ছিল অধিকতর ফ্লোরাইড। ফ্লোরাইডের একটি গুণ- তা পানিতে অত্যন্ত সংক্রিয়ভাবে কোন প্রকার জার্ম সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ প্রতিহত করে। ফলে জমজমের পানি বহুদিন পর্যন্ত রেখে দিলেও পানিতে শেওলা সৃষ্টি হয় না। পানিতে পোকা জন্মে না। ইউরোপীয় ল্যাবরেটি থেকে প্রাপ্ত রিপোর্টে এটা উল্লেখ ছিল যে, জমজমের পানি পানের উপযুক্ত ।

ইউরোপীয় ল্যাবরেটরী থেকে প্রাপ্ত রিপোর্টে এই বিষয়টি প্রামাণিত হলো যে, মিসরীয় ডাক্তারের জমজম পানি সম্পর্কে প্রদত্ত বক্তব্যটি গবেষণা প্রসূত ছিল না বরং ছিলো বিদ্বেষজাত।

এ বিষয়টি বাদশাহ ফয়সাকে অবহিত করা হলো। তিনি প্রীত হলেন এবং যে যে পত্রিকায় মিসরীয় ডাক্তারের মন্তব্যটি প্রকাশ পেয়েছিল সে সমস্ত পত্রিকায় প্রতিবাদ পাঠাবার নির্দেশ দিলেন । একদিক দিয়ে মিসরীয় ডাক্তারদের জমজমের পানি সম্পর্কে যে বিরূপ সমালোচনা ছিল শাপেবর বা ছদ্মভাবে আশির্বাদ। এই সমালোচনা না হলে বিষয়টি বাদশাহ ফয়সালের নজরে আসতো না। জমজমের পানির রাসায়নিক উপদানের পরীক্ষাও হতো না।

বস্তুত ঃ যতই আমার চিন্তা গবেষণা করি ততবেশী বিস্ময় আমাদের সম্মুখে উন্মোচিত হয়। কোন এক পর্যয়ে আল্লাহর নিদর্শনসমূহের ক্ষেত্রে জমজমের আলৌকিকতা আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। দেশ-বিদেশ ও বহুদূর থেকে বিশ্বাসীগণ হজ করতে মক্কায় আসেন। এই পানি তাদের জন্য আল্লাহর এক অপার রহমত ও অনুদান।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ হতে জমজমের পানির কয়েটি বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। জমজম কূপটি কখনো শুকিয়ে যায়নি। পক্ষান্তরে পানির চহিদা যত বেড়েছে কূপের পানির সরবরাহও সে অনুপাতে বেড়ে গেছে। জমজম কূপের পানিতে লবণাক্ত এবং স্বাদ সুদূর অতীতে যেমন ছিল বর্তমানেও তাই আছে। এ পানির স্বাদ একটুমাত্রও পরিবর্তিত হয়নি।

জমজমের পানির পেয়তা বা পান করার গুণাবলী অতি প্রাচীন। বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে হাজীরা হজ ও উমরা উপলক্ষে মক্কায় আসেন। জমজমের পানি পান করে থাকেন। সারা বছরই তাদের আগমন অব্যাহত থাকে। কিন্তু কেউ কোনদিন এ অভিযোগ করেননি যে, জমজমের পানি পান করে তাদের কোনরূপ অসুবিধা হয়েছে।

পক্ষান্তরে এ পানি রোগ নিরাময়ক হিসেবেই বিবেচিত হয়েছে । মক্কা মদিনায় হাজীরা জমজমের পানি যতবেশী তাদের পক্ষে সম্ভব, পেট ভরে পান করে থাকেন এবং সঙ্গে করে নিয়েও যান। বিভিন্ন স্থানে পানির স্বাদের পরিবর্তন হয়। কিন্তু, জমজমের পানির স্বাদ অপরিবর্তনীয়।

জমজমের পানি কখানো রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরিশোধনের প্রয়োজন হয়নি। এ পানিতে ক্লোরিন মেশানো হয়নি বা ক্লোরিন দ্বারা জীবাণুমুক্ত করা হয়নি। যেমন বিভিন্ন নগর, জনবহুল এলাকায় সরবরাহকৃত পানি ক্লোরিনের সাহায্যে পরিশোধিত করা হয়।

পানিতে সাধারণত জলজ উদ্ভিদ, শৈবাল, শেওলা বা ক্ষুদ্র আলজি জন্মে এগুলোতে প্রাণ থাকে এবং উষ্ণতায় বা বিষাক্ততায় মরে যায়। পানিতে জীবাণুর জন্ম হয়। এর ফলে পনির স্বাদ ও গন্ধ পরিবর্তন হয়। কিন্তু জমজমের পানিতে কখনো জলজ জীবাণু বা উদ্ভিদের জন্ম হয়নি। ফুটন্ত বা পরিশোধিত জীবাণুমুক্ত পানি রেখে দিলেও কিছুকাল পর তাতে জলজ উদ্ভিদ বা জীবাণুর সৃষ্টি হয়। কিন্তু বছরের পর বছর টিন, ক্যান বা বোতলে জকজমের পানি রেখে দিলে দেখা যায় এতে কোনো জীবাণুর সৃষ্টি হয় না।

আল্লার অসীম কৃপায় বিবি হজেরা (আঃ) ও তদীয় শিশুপুত্র হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর জন্য জমজমের ধারা সৃষ্টি হয়েছিল। এতে সংমিশ্রিত হয়েছিল আল্লাহর খাস রহমত। যার ফলে জমজমের পানি পেয়েছে এমন সব অত্যাশ্চার্য বৈশিষ্ট্য যা অন্য কোনো এমন কি আকাশ থেকে বর্ষিত পবিষ্কার পনিতেও থাকে না। জমজমের পানির সঙ্গে কোনো পানির তুলনা হয় না। (করাচী হতে প্রকাশিত দৈনিক ইংরেজী ‘ডন’ পত্রিকা। শুক্রবার জুলাই ১২, ১৯৯৬ ইং)।

অনুবাদ ঃ এ, জেড, এম, শামসুল আলম

ইসলামী আইনের রূপরেখা : প্রেক্ষিত জননিরাপত্তা

ড. মোঃ আনছার আলী খান

॥ এগার ॥

৬. জরিমানা, সম্পত্তি আটক ও বাজেয়াপ্ত।

কারাদণ্ড (আল হাবস), (ক) নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অথবা (খ) অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য)।

৮. বেত্রাঘাত, গাছের ছাল দ্বারা প্রহার (আল জানুত)

৯. মৃত্যুদণ্ড (আল-তাযির বিল কাতল)।

অনেক ক্ষেত্রে বিচার মূল শাস্তির সাথে প্রয়োজন মনে করলে তাযিরের শাস্তি যুক্ত করে দিতে পারেন। এটি বিচারকের স্বেচ্ছাধীন।

তাযিরের শাস্তিযোগ্য কতিপয় অপরাধ

মিথ্যা সাক্ষ্যদান, সুদ, ঘুষ গ্রহণ, ঘুষ প্রদান, আমানতের খেয়ানত, পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকা দেয়া, ওজনে কম দেয়া, বেশী গ্রহণ করা, প্রতারণা করা, কাউকে অপমান করা, অপরাধীকে আত্মগোপনে সহায়তা করা, যেনা ব্যতীত অন্য কোন অপবাদ আরোপ, নামাজ রোজা, যাকাত প্রভৃতি ফরজ কাজ ত্যাগ ইত্যাদি অপরাধে তাযিরের শাস্তি দেয়া যেতে পারে। নিসাব পরিমাণের সম্পদ চুরির ক্ষেত্রে তাযিরের শাস্তি দেয়া যাবে।

জননিরাপত্তা বিধানে তাযিরের শাস্তির গুরুত্ব ঃ মানব সমাজে জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে তাযিরের শাস্তির

বিধান সত্যি খুব ফলপ্রদ। কেননা হদ্দ ও কিসাস-এ মাত্র কয়েকটি অপরাধের সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিধান করা হয়েছে। এর বাইরে হাজারও প্রকৃতির ও ধরনের অপরাধ রয়েছে বা সংঘটিত হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে ইসলামী আইন, অন্যান্য মানব রচিত আইনের মতো শাস্তির বিধান করে। বিচারকের হাতকে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখেনি। বিচারক যে কোন অপরাধের নির্ধারিত অপরাধের শাস্তি ব্যতীত শাস্তি দিতে পারেন। এ থেকে বলা যায় যে, ইসলামী আইনে কোন অপরাধই শাস্তির আওতামুক্ত নয়। সকল অপরাধের শাস্তির বিধান রয়েছে। সুতরাং মানব রচিত আইনে শাস্তির বিধান থেকে ইসলামী আইনে শাস্তির বিধান অধিক জননিরাপত্তা বিধানে কার্যকর।

ইসলামী আইনে জননিরাপত্তা বিধানে দণ্ড দর্শনের মর্মকথা ঃ ইসলামী আইনে জননিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় শাস্তির বিধান প্রবর্তনের উদ্দেশ্য সমাজে আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে বিচ্যুতি বা লংঘনের দরুন সৃষ্ট অবস্থার কার্যকর নিয়ন্ত্রণ, যাতে সমাজে সুবিচার ও ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠিত থাকে।

শাস্তি দানের ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হলো ঃ (ক) অপরাধীর অপরাধপ্রবণ মন শাস্তির কঠোরতা দেখে যেন শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করে। শাস্তিদানের কঠোরতায় সমাজে অপরাধের সংখ্যা দ্রুততার সাথে শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। কেননা শাস্তির কঠোরতার মাত্রা যখনই কম করা হয় তখন সমাজে অপরাধের সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পায়।

(খ) শাস্তির ভয়াবহতা শাস্তিকে এমনভাবে ভয়াবহ করে তোলা যাবে অপরাধীর মনে একটা তীব্র ভীতির ভাব উদ্রেক হয় যা দ্বারা অপরাধী অপরাধের পুনরাবৃত্তি থেকে বিরত থাকে।

(গ) প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করা অপরাধ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির মনে যে প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে উঠে তা ইনসাফপূর্ণ বাস্তবায়নের পরিবেশ সৃষ্টি করা।

সমাজ থেকে অপরাধ নির্মূলের উপরোক্ত ভাবধারা সঠিকভাবে অর্জনে তিনটি উপায় ইসলামী আইন সুনির্দিষ্টভাবে অবলম্বন করেছে : (ক) অপরাধমূলক কাজটি বাস্তবিকই অপরাধ হিসেবে চিহ্নিতকরণ।

(খ) অপরাধের জন্য অনুমোদিত শাস্তি যথার্থ, এছাড়া অন্য কিছু নয়।

(গ) শাস্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের প্রতি বলিষ্ঠ বিশ্বাস এবং শাস্তিদান প্রক্রিয়া যথার্থ কার্যকারিতা।

উপরোক্ত বিষয় তিনটি কেবলমাত্র ইসলামেই সম্ভব, অন্য কোন মানব রচিত আইনে নয়। বস্তুত এ কারণে মানব রচিত আইনে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড চিহ্নিত, উহার শাস্তির প্রকৃতি ও মাত্রা খুবই পরিবর্তনশীল হওয়ায় অপরাধীকে শাস্তিদানের বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ও অপরাধী কারোরই কোন দূর আস্থা থাকে না। দুর্নীতি ও অন্যান্য আনুকূল্যের কারণে শাস্তি প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের প্রতি শাস্তি ভোগকারীর বলিষ্ঠ কোন আস্থা থাকে না।

এক্ষেত্রে শাস্তিদানের যে প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তা বহুলাংশে অপরাধের প্রশিক্ষণ এবং অপরাধ নিবৃত্তিমূলক শিক্ষা বর্জিত। বস্তুত এ কারণে মানব রচিত আইনে জননিরাপত্তা বিধানে শাস্তির বিধান একটি হাস্যকর উদ্যোগ বলে বিবেচিত হয়।

দ্বিতীয়ত: সমাজের মানুষের প্রয়োজন পূরণের নিরাপত্তা বিধানের পদক্ষেপ : মানুষকে আল্লাহ এই পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধির দায়িত্ব দিয়ে আনুগত্যের পরীক্ষার জন্য সৃষ্টি করেছেন।

রাষ্ট্রীয় সামাজিক জীবনে মানুষের নিরাপত্তার বিষয়টি মূলত মানুষের এই দায়িত্বের পরীক্ষার সফলতা ও ব্যর্থতার মধ্যে বিস্তৃত।

আল্লাহপাক তাঁর সকল সৃষ্টিকে একমাত্র তাঁরই ইবাদত বা আনুগত্য করার জন্য সৃষ্টিপূর্বক আনুগত্যের জন্য যেসব উপকরণ ও বিধান প্রয়োজন তারও সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা করেছেন। মানুষ ছাড়া সকল সৃষ্টির ক্ষেত্রে তা স্বয়ত কষ্টকর বিধায় সকল সৃষ্টির মানুষ ব্যতীত নিরাপত্তা সুনিশ্চিত। এ জন্য তাদের কারোর মুখাপেক্ষী হতে হয় না বা তাদের নিরাপত্তা অন্য কোন সৃষ্টির মর্জির ওপর নির্ভরশীল নয় বা কেউ তাতে হস্তক্ষেপ করে না।

মানবতার সুন্দরতম আদর্শ

রবিউল ইসলাম

হযরত রাসূলেপাক (সঃ) ভিতর-বাহির এক এবং অভিন্ন সত্যের আলোয় আলোকিত।

তাঁর জীবনে কোন অস্পষ্টতা নেই।

‘রাসূল (সঃ) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ মানুষ। আল্লাহর রাসূলের জীবনের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য সুন্দরতম আদর্শ।’

(সূরা আজহার ঃ ২১)।

বস্তুত তাঁর মত নিখুঁত অতুলনীয় এবং অনুপম আদর্শের কোন দৃষ্টান্ত নেই।

তাঁর তরিকায় রয়েছে শান্তি কামিয়াবি ও সফলতা। একমাত্র তাঁর আদর্শের মধ্যেই মানব জাতির ইহকালীন-পরকালীন শান্তি এবং মুক্তির চিরস্থায়ী গ্যারান্টি রয়েছে।

তিনি দেখতে কেমন ছিলেন, কী খেতে পছন্দ করতেন, কী রকম পোশাক পরতেন, নবী জীবনের দৈনন্দিন কার্যক্রম কেমন ছিল। এসব খুঁটিনাটি বিষয় সাহাবি (রাঃ)গণ বিস্তারিত লিখে গেছেন। সেখান থেকে সংক্ষিপ্তাকারে কিছু উদ্ধৃত করা হল। হযরতের খাবার ছিল রুটি, গোশত, সবজি, খেজুর, মধু, শসা, তরমুজ, ঘি, পনির ও দুধ। তিনি মাটিতে বিছানা পেতে খেতে বসতেন।

খাবারের ব্যাপারে তিনি স্বাস্থ্যবিধি পুরোপুরি মেনে চলতে উপদেশ দিতেন। খাওয়ার সময় তিন ভাগের একভাগ খাবার, একভাগ পানি এবং বাকি এক ভাগ খালি রাখতে বলতেন। এভাবে আহার করলে স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

নবী জীবনের দৈনন্দিন কার্যক্রম : নবী করীম (সঃ) দৈনন্দিন জীবনের কাজ রুটিনমাফিক পরিচালনা করতেন। দিন-রাতের তিন ভাগের একভাগ সময় ইবাদত, একভাগ পরিবার-পরিজন ও গৃহর্কমের জন্য এবং আরেক ভাগ দ্বীনি–তাবলীগ ও নিঃস্ব দুস্থজনের সেবায় ব্যয় করতেন।

ফজরের সালাত শেষ হওয়ার পর নবীজী জায়নামাজেই লোকদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন। এক প্রহর পর্যন্ত তিনি এ আসনে বসেই সাহাবাদের উপদেশ দিতেন। বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতেন। কেউ স্বপ্নের বয়ান করলে তার ব্যাখ্যা করতেন। বিদেশী প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন গোত্র থেকে আগত লোকদের সাথে এ সময়েই নবীজী সাক্ষাতদান করতেন। এই বৈঠকে অভিযোগ শোনা এবং বিচার নিষ্পত্তিও করা হত। বৈঠক শেষে চাশতের সালাত পড়ে নবীজী ঘরে ফিরতেন।

অতঃপর গৃহপালিত পশুর পরিচর্যা, দুগ্ধ দোহন, বাজার থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয়, ঘরবাড়ি পরিষ্কার করা, পুরানো কাপড় সেলাই প্রভৃতি কাজ নির্দ্বিধায় করতেন। জোহরের সালাতের আগেই দুপুরের খানা খেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতেন। জোহরের সালাত আদায় করেই বের হতেন মসজিদ বা অন্য কোথাও তাবলীগ ও তালিমের কাজে। এশার আগ পর্যন্ত ঘরে পরিবারের সবাইকে নিয়ে আলোচনায় বসতেন। এশার সালাত শেষ করেই বিছানায় চলে যেতেন। রাতের অর্ধপ্রহর পার হতেই জেগে উঠতেন। বেশির ভাগ রাত নবীজী ফজর পর্যন্ত ইবাদত-বন্দেগী করে কাটিয়ে দিতেন।

নবীজীর দৈনন্দিন জীবনযাপনের উপকরণ

মহানবী (সঃ)-এর বাসস্থান ছিল মসজিদে নববীর পাশে ছয়হাত চওড়া এবং আট হাত লম্বা কুঠির। এগুলোতে খেজুর পাতার ছাউনি ছিল।

নবীজী জীবনের অধিকাংশ সময় মাটির উপর চাটাই বিছিয়ে শুয়েছেন। তাঁর আসবাবপত্র ছিল একটি বিছানা, পানি রাখার একটি চামড়ার মশক, পানি পানের জন্য কাঠের পেয়ালা।

জীবনের শেষরাতে ঘরে বাতি দেয়ার মত তেলও তিনি রাখেননি। অথচ তখন তিনি ছিলেন জাজিরাতুল আরবের একচ্ছত্র অধিপতি রাষ্ট্রনায়ক।

নবীজীর দৈনন্দিন আচার-আচরণ

নবীজী সবসময় হাসিমুখে থাকতেন, সঙ্গী-সাথীদের সাক্ষাত হওয়ামাত্র ছালাম দিতেন। কথাবার্তা ছিল অত্যন্ত মধুর। হৃদয়গ্রাহী ছিল তাঁর বাচনভঙ্গি।

মহানবীর বাগ্মিতা ছিল অপূর্ব। কোরআন পাঠ করার সময় কণ্ঠ হয়ে উঠত আবেগময়। বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য রেখে আওয়াজ উঠা-নামা করত।

নির্দোষ খেলা, ঘোড়দৌড়, কুস্তি ও তীর নিক্ষেপ চর্চার জন্য উপদেশ দিতেন। নবীজীর শিশুদের খুব পছন্দ করতেন। সময় পেলেই তাদের সঙ্গ দিতেন, তাদের আবদার পূরণ করতেন।

দান করা : নবীজী জন্মগতভাবেই ছিলেন অত্যান্ত উদার ও মহৎ। তাঁর বদান্যতা ছিল তুলনাহীন। জীবনে কখনো তিনি কোন সাহায্য প্রার্থীকে ফিরিয়ে দেননি। কিছু থাকলে তৎক্ষণাৎ দিয়ে দিতেন। কখানো অভাবগ্রস্ত লোক এলে ক্ষুধা- তৃষ্ণা ভুলে যেতেন । এবং নিজের খাবারটুকু পর্যন্ত তাদের হাতে তুলে দিয়ে নিজের পরিজনসহ উপবাস থাকতেন।

সরলতা : হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুরপাক (সঃ) প্রয়োজনে নিজে বাড়ি বাড়ি গিয়ে রোগীদের সেবা করতেন। কারো মৃত্যু হলে জানাজায় শরীক হতেন। ক্রীতদাসদের দাওয়াত কবুল করতেন । খাদিম-চাকরদের সাথে বসে খানা খেতেন। তাদের সাথে আটা গুলতেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, উত্তম চরিত্রের দিক দিয়ে হুজুর (সঃ)-এর চেয়ে অগ্রগামী আর কেউ ছিলেন না, হতেও পারেন না। যে কেউ এসে ডাক দিলে এমনকি ঘরের কেউ সম্বোধন করে কিছু বললে সাথে সাথে লাব্বাইক (হাজির আছি) বলে জওয়াব দিতেন।

বিশ্বনবী (সঃ) বলতেন, নামাজি সচ্চরিত্র লোকের চেয়েও দরিদ্রের সাহায্যকারী ও বিনয়ী লোক উত্তম। সৎ উপার্জনকারীকে অধিক ইবাদতকারীর চেয়ে উত্তম বলেছেন। তিনি সমাজে আর্থিক সাম্য আনার উপর বেশি গুরুত্ব দিতেন। তিনি নিয়ম করেছেন চারদিকের লোকজনের ঘরের খবরাখব নেবে এবং তাদের প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা দেবে।

ইসলামী কর্মতৎপরতা

জামিয়া শারইয়্যা মালিবাগ

গত ৫ ফেব্রুয়ারী খিলগাঁও উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে জামিয়া শারইয়্যা মালিবাগ-এর কৃতী ছাত্র সম্মাননা সনদ ও পাগড়ী প্রদান মহাসম্মেলন শুরু। জামিয়ার সিনিয়র মুহাদ্দিস মাওলানা আরীফ উদ্দীন মারুফ জানান, দারুল উলুম দেওবন্দের সিনিয়র মুহাদ্দিস মাওলানা আরশাদ মাদানী মহাসম্মেলনটি উদ্বোধন করেন। তাছাড়া সম্মেলনের প্রথম দিনে আলোচনা করেন শাইখুল হাদীস মাওলানা তাফাজ্জুল হক, বেফাক সভাপতি মাওলানা আহমদ শফী ও দারুল উলুম দেওবন্দের শাইখুল হাদীস মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী। জামিয়া শারইয়্যার প্রিন্সিপাল মাওলানা কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ জানান, তিন দিনব্যাপী দস্তারবন্দী মহাসম্মেলন একটি বরকতময় অনুষ্ঠান। এটি শুধু পাগড়ি প্রদান অনুষ্ঠানই নয় ৩০ বছরের নতুন পুরাতন ছাত্রদের একটি স্বর্গীয় মিলনমেলাও বলা চলে।

রাফায়াত ইসলামী সাংস্কৃতিক সংস্থা

গত ১৪ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার রাফায়াত ইসলামী সাংস্কৃতিক সংস্থা রাইসাস রংপুর জেলা শাখার জরুরি বৈঠক রংপুর সদর হাসপাতাল মসজিদে বাদ এশা জেলা পরিচালক এম ইউনুছ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাফায়াত ইসলামী ছাত্রকল্যাণ ফাউন্ডেশনের জেলা পরিচালক এফএম মশিউর রহমান সুমন, ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক এইচএম নাসিরুল্লাহ, ভারপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক রাহাতুল ইসলাম, রাইসাস নির্বাহী পরিচালক আসাদুজ্জামান আসাদ, নাট্য ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ক্বারী মাওঃ আজিজুল ইসলাম, অর্থ-সম্পাদক আঃ রাজ্জাক রাজু, কার্যকরি সদস্য শেখ আবু রায়হান, আব্দুস সালাম আমিন প্রমুখ। বৈঠকে বার্ষিক শিক্ষা সফর বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন দায়িত্ব বণ্টন করা হয়। তাছাড়া নতুন কমিটি গঠন, ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সাপ্তাহিক আসর, সদস্য-সুধী কালেকশনসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পরিশেষে সভাপতি তার বক্তব্যে নতুন প্রজন্মকে সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা এবং অপসংস্কৃতি থেকে দূরে থাকার আহবান জানান।

খাজা মোজাম্মেল হক (রঃ) ফাউন্ডেশন

মানবকল্যাণে নিবেদিত অলাভজনক সংগঠন খাজা মোজাম্মেল হক (রঃ) ফাউন্ডেশন বরাবরের মত এ বছরও সিরাজগঞ্জ জেলার ৩১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নবম ও দশম শ্রেণীর ১৬৮ জন মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে বৃত্তি প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে। গত ২৫ জানুয়ারী, ২০১০ জেলার কামারখন্দ উপজেলার জামতৈল ধোপাকান্দি বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বার্ষিক বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

খাজা মোজাম্মেল হক (রঃ) ফাউন্ডেশন-এর চেয়ারম্যান 'খাজা টিপু সুলতান' উৎসবমুখর এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ক্রেস্ট ও নগদ অর্থ প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সিরাজগঞ্জ জেলার পুলিশ সুপার মোশারফ হোসেন ও কামারখন্দ উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ জিয়াউল হক। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জামতৈল ধোপাকান্দি বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দীপক রঞ্জন চক্রবর্তী। ফাউন্ডেশনের বৃহত্তর কুমিল্লা অঞ্চলের প্রধান সমন্বয়কারী প্রকৌশলী খুরশীদ আহম্মদের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বৃহত্তর উত্তরাঞ্চলের প্রধান সমন্বয়কারী মোঃ আনসার আলী খান জয়।

কৃতি শিক্ষার্থীদের পদচারণায় মুখর অনুষ্ঠানে ৩১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও প্রধান শিক্ষক, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং খাজা মোজাম্মেল হক (রঃ) ফাউন্ডেশনের পদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। অতিথি হিসাবে ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারী আলহাজ্ব জোবায়ের হোসেন, কোষাধ্যক্ষ আলহাজ ফারুক হোসেন, বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চলের প্রধান সমন্বয়কারী মাহবুবে এলাহী বুলবুল, বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের প্রধান সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আলী এবং ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য মোঃ শামছুল আলম উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, একটি অলাভজনক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে খাজা মোজাম্মেল হক (রঃ) ফাউন্ডেশন ২০০১ সাল থেকে প্রতি বছর সিরাজগঞ্জের বিভিন্ন স্কুলের নবম এবং দশম শ্রেণীর মেধা তালিকার প্রথম তিনটি স্থান অধিকারী ছাত্রছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করছে।

এছাড়াও ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে দেশের বিভিন্ন জেলায় দরিদ্র এবং কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর মধ্যে আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে 'ছাদকা-ই-জারিয়া' হিসেবে ক্ষুদ্র মূলধন প্রদান এবং চিকিৎসা সেবা কর্মসূচী নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে।

সূত্র : প্রেস বিজ্ঞপ্তি